২৪

তারিখ ...09 SEP 1994 ... ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪ ...

দৈনিক বাংলা

শিক্ষা, সাক্ষরতা, হরতাল ও বর্জন

'আমি নিরক্ষর থাকব না, সাক্ষর হব'— এমন একটা অঙ্গীকার নিয়ে গত বৃহস্পতিবার দেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়েছে। বাংলাদেশ—যেখানে জনসংখ্যার অধিকাংশই অক্ষর-জ্ঞানবঞ্চিত সেখানে এই দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে এক বাণীতে বলেছেন যে শিক্ষা বাংলাদেশী নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যময়। নিরক্ষর সমাজ দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। সাক্ষর সমাজ ছাড়া মেধাবী, উত্তম ও উদ্যোগী মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে মানবসম্পদ সৃষ্টি করে তাকে জাতীয় উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস কার্যকরভাবে পালন করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের উদ্যোক্তা জাতিসংঘ। প্রায় ৪৫ বছর আগে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় শিক্ষাকে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবে উল্লেখ করা হয়। সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, প্রকৃতপক্ষে সেই ঘোষণাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্যই আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়ে থাকে প্রতি বছর। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশেও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে এই দিবসটি পালন করা হচ্ছে। অবশ্য কেবল বাংলাদেশেই নয়; বিশ্বের অন্যান্য দেশেও, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশেই এই দিবসটি পালন করা হচ্ছে।

কেননা, অক্ষরজ্ঞান থেকে বঞ্চনার সমস্যাটি তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য প্রপীড়িত প্রতিটি দেশেরই। এর ফলে ঐসব দেশে উন্নয়নের সহায়ক শক্তি জনসম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে, ঐসব দেশের অনগ্রসরতার অবসান ঘটছে না। অথচ এই অবস্থায় বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করতে হচ্ছে। এই দেশগুলো স্বীকার করতে হবে, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একেবারেই প্রস্তুত নয়। প্রস্তুতির প্রাথমিক অংশ হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার করতে হবে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত হবে নতুন শতাব্দী শুরু হবার আগেই। এই পথ আমাদেরও বেছে নিতে হবে। দেশের প্রতিটি মানুষকে সাক্ষর করতে হবে। অশিক্ষা বা শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা থেকে মুক্ত করতে হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে স্বাধীনতার পর প্রায় সিকি শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তথা জনশক্তি গড়ে তুলতে পারিনি। গত ২৪ বছরে শিক্ষিতের হার বেড়েছে মাত্র ৪ শতাংশ। তবে সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার তেমন হতাশাব্যঞ্জক নয়। কেননা, এই সময় দেশে সাক্ষরতার হার বেড়েছে শতকরা ১৪ ভাগ। এর ফলে এখন দেশে সাক্ষরতার হার পৌঁছেছে ৩৪·৩২ শতাংশে। এটাকে আমরা সন্তোষজনক বলি না। এর জন্য আত্মশ্লাঘাও অনুভব করি না। কেননা, কোন কোন উন্নত দেশে শিক্ষার হার এমনকি ৯০ শতাংশকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাই ৩৪·৩২ শতাংশ সাক্ষরতা নিয়ে সন্তোষ বোধ করা যায় না। আমাদের লক্ষ্য হবে, দেশের প্রতিটি নাগরিককে সাক্ষর করে তোলা। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়, দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে। কেবল সাক্ষরতা নয়, কেবল প্রাথমিক শিক্ষা নয়, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের যথাযথ উন্নয়ন করতে হলে এছাড়া আর কোন পথ নেই।

এই লক্ষ্য মহান, কিন্তু পথ বন্ধুর। তা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দেশে শিক্ষা সম্প্রসারণের বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিয়েছেন। গত অর্থবছরে এবং বর্তমান অর্থবছরে বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকেই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

আমাদের দেশে নারী শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। দেশে শিক্ষিতের হার অল্প, নারী শিক্ষার হার আরো কম। শহরের মুষ্টিমেয় নারী শিক্ষার সুযোগ পায়। গ্রামের মেয়েরা প্রায় সবাই এই সেদিন পর্যন্ত ছিল শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এর প্রধান কারণ হল, দারিদ্র্য। এ কারণে শহরের তো বটেই গ্রামের অধিকাংশ নারীর পক্ষেই শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ একটি দেশকে গড়ে তুলতে হলে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াস অপরিহার্য। নারীদের পশ্চাৎপদ রাখলে জাতির কখনোই সত্যিকার অর্থে অগ্রগতি সাধিত হবে না। সুতরাং, নারী ও পুরুষকে শিক্ষার সমান সুযোগ দিতে হবে। এই অবস্থায় বর্তমান সরকার দেশে নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য এক বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। নারীদের শিক্ষায় উৎসাহদানের জন্য, দারিদ্র্য যাতে শিক্ষার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা পর্যায়ে মেয়েদের আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে— চালু হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। সৌভাগ্যের বিষয়, ইতিমধ্যেই এই কর্মসূচীতে সাফল্য এসেছে। বিপুলসংখ্যক মেয়ে এই কর্মসূচীর আওতায় স্কুলগুলোতে ভর্তি হচ্ছে। অন্যদিকে গণশিক্ষা কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে দেশে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী নামে যে কর্মসূচী চালু করা হয়েছে তার ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতেও ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ঝরে পড়ার হারও উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

দেশে শিক্ষা বিস্তার এবং বিশেষ করে নারী শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে বর্তমান সরকার এক নীরব বিপ্লব সাধন করে চলেছেন। গ্রামাঞ্চলের রিপোর্ট হচ্ছে, দলে দলে মেয়েরা এখন স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। নারী শিক্ষাই যে নারী মুক্তির অন্যতম পথ সে কথা আমাদের দেশের অনেক অতি প্রগতিবাদী বুঝতে চান না। তারা ভিন্ন ইস্যু তুলে প্রকৃতপক্ষে নারী মুক্তির সম্ভাবনাকেই বিনষ্ট করে দিচ্ছেন। বাংলাদেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নারীশিক্ষা ও নারীর কর্মসংস্থানই প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য—'জরায়ুর স্বাধীনতা' নয়।

বর্তমান সরকার এসব কর্মসূচীর পাশাপাশি সাক্ষরতা অভিযানও চালিয়ে যাচ্ছেন। সবাই যাতে পড়তে জানে, চিঠিপত্র লিখতে-জানতে, ছোটখাটো হিসাব করতে জানে— এমন একটা লক্ষ্য স্থির করে দেশের সর্বত্র চলছে সাক্ষরতা অভিযান। তবে মনে রাখতে হবে যে দেশে শিক্ষাবঞ্চিত বিপুল জনসংখ্যাকে সাক্ষর করার অভিযান একটা বিরাট কর্মকাণ্ড।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সাক্ষরতা দিবসের বাণীতে বলেছেন, বাংলাদেশী নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার গৃহীত কর্মসূচীর পরিপূরক হিসাবে সকল সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও দলমত নির্বিশেষে সকল নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে।

আফসোসের বিষয়, আমাদের দেশের কয়েকটি বিরোধীদল সম্পূর্ণ নেতিবাচক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। যেখানে দরকার শিক্ষা, চাকরি ও উৎপাদন বৃদ্ধি সেখানে তারা নির্বাচিত, প্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় অচল করে দেবার কর্মসূচী গ্রহণ করে বসে আছে। যে হরতাল ধর্মঘট ও অবরোধ শিক্ষা তো বটেই—জাতীয় উৎপাদনকেও বিঘ্নিত করে, সে কর্মসূচীই তারা এখনও আঁকড়ে ধরে বসে আছে। মসনদের মোহ তাদের এতই অন্ধ করে ফেলেছে যে তারা দরিদ্র সর্বসাধারণের স্বার্থের দিকও দেখতে পাচ্ছে না।

বেদনা বোধকরি, যখন দেখি প্রায় বারো কোটি মানুষের একটি দরিদ্র দেশের ভাগ্য নিয়ে এমনভাবে জুয়া খেলা হচ্ছে। কোথায় শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রচেষ্টা অগ্রাধিকার পাবে—না, তার বদলে হরতাল, অবরোধ আর ভাঙচুরের কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রতিটি দেশে জাতীয় সংসদই সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশেই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে— তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়। বিরোধীদলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলাও স্পষ্টভাবে বয়ান করা হয়নি— কিন্তু তারই ভিত্তিতে 'এক দফার' আন্দোলন শুরু করে দেয়া হয়েছে।

মানুষ চায় শিক্ষা, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান। যে আন্দোলনের জনভিত্তি নেই, তা কখনও সফল হয় না। বর্তমান সরকার জনবিচ্ছিন্ন নয়। বিরোধী কয়েকটি দল রাজনৈতিক হিসাবে ভুল করে ফেলেছে।

ধান ভানতে শিবের গীত? না, তা নয়। বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসংস্থানের কর্মসূচী সফল করতে হলে বিরোধী দলগুলিকে নেতিবাচক কর্মসূচী পরিহার করতে হবে।

— পর্যবেক্ষক